গান্ধীর আততায়ী

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

বেয়াল্লিশ বছর বয়সি উদয় চৌধুরী আজকের খেলাটা আগে মাত্র একবারই খেলেছে। সেই খেলার দিনটা আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। ৩০শে জানুয়ারির ওই ভোরবেলায় পুরোনো ট্রাঙ্কের কী না কী ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ ক্রিস হারডিকের ছবিটা বেরিয়ে পড়েছিল। সেইসঙ্গে ক্রিসের উপহার এক প্যাকেট তাস আর একটা রিভলবার। রিভলবারটায় টোটা ভরা ছিল না। পাশের এক কৌটোয় গুলিগুলো ছিল। টোটাগুলো খুঁজতে গিয়েই উদয়ের ভারি লোভ হল ক্রিসের শেখানো খেলাটা খেলে দেখে। ক্রিসের বক্তব্য ছিল যে, হয় ভয়ংকর দুঃখ অথবা ভয়ানক আনন্দের দিনগুলোতে মানুষের উচিত নিজের সঙ্গে একবার লড়ে নেওয়া। যে ভাগ্যের জটিল পথে দুঃখ কিংবা আনন্দ আসে সেই ভাগ্যকেই সাক্ষী মেনে নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড়াতে হয়। একটা টোটা ভরে নিতে হয় রিভলবারে। তারপর তাসের প্যাকেট চোখ বুজে শাফল করে তিনটে তাস বার করে নিতে হয়। বলতে হয় এই রংটা উঠলে আমার মৃত্যু হবে। আর সত্যি সত্যি যদি সেই রং উঠে আসে হাতে তুমি জানবে গুলিটা তোমার নিজের খুলির জন্যই ভরা হয়েছিল। নিয়তি তোমাকে চায়।

যেদিন ক্রিস এই খেলাটা শেখায় উদয়কে ঠিক সেদিনই ওদের মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে একটা চিঠি এসেছিল। তাদের প্রথম পরিচয়ের সাত বছর পর লিজা ক্রিসকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। বড়ো ঘরের মেয়ে, পাবলিক স্কুলে পড়া মেয়ে লিজার সঙ্গে ক্রিসের আলাপ নেহাতই আকস্মিকভাবে। একটা ফুটবল গ্রাউণ্ডে। সদ্য স্কুল-পাস করা ক্রিস বিয়ের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল। ভুলে গেল তার জন্ম লিভারপুলের এক শ্রমিকের ঘরে। আর লিজা কিছুটা লতায়-পাতায় এক পড়ন্ত ব্যারন ফ্যামিলির কন্যা। লিজা নিজেই এই ব্যবধানটাকে খুবই বড়ো বলে জানত। ওর অভিভাবকরা তো নিশ্চয়ই। প্রেমের বিষম দংশনে উন্মত্তপ্রায় ক্রিস প্রথম খেলেছিল এই টোটা-তাসের খেলা। তাও তিন তিন বার। কিন্তু একবারও ওর মৃত্যুর রংটা উঠল না। ভীষণ মনমরা হয়ে ক্রিস যুদ্ধে চলে গেল।

তারপর সাত বছর ধরে এখানে-ওখানে বাহিনীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে ক্রিস। যেখানেই গেছে সুবিধেমত চিঠি দিয়েছে লিজাকে। কিন্তু কখনো বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি। ইচ্ছে হলে কখনো কখনো ওর গভীর ভালোবাসা নিবেদন করেছে। অতএব সেদিন যখন ক্যান্টনমেন্টে লিজার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে রঙিন খামটা এল, ভয়ংকর উত্তেজনা এবং আনন্দের জোরে ক্রিস ঠিক করল যে, ওর পুরোনো খেলাটা ফের খেলবে। এতখানি অবাক উদয় তার আগে কখনও হয়নি। ছেলেটা কি পাগল? এরকম সুসংবাদ পেয়ে কেউ কি নিজের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলে? দৈবাৎ যদি মৃত্যুর রং ওঠে!

সেদিন সন্ধ্যায় ক্রিসের কপালে মৃত্যুর হরতন উঠল। ক্রিস ওর মৃত্যুর রং দিয়েছিল হরতন। কারণ হরতনে মৃত্যু এবং ভালোবাসা একই সঙ্গে থাকে। খেলার শেষে রিভলবারে টোটা ভরতে ভরতে এক গেলাস রাম খেল ক্রিস। তারপর তাসের প্যাকেটটা উদয়কে দিয়ে বলল, আমার এই উপহারটা রইল। কোনো না কোনোদিন হয়তো তোমারও কাজে লাগবে। তবে যেদিনই খেল,

খেলার সম্মানটুকু রেখো। জানি, নিজেকে খুন করা খুব কঠিন। সেক্ষেত্রে নিজের প্রিয়তম কোনো কিছুর ওপর বাজি ধরতে পার।

ক্রিসের কথাটায় উদয় চমকে উঠল। নিজের প্রিয়জনের জীবনের ওপর কেউ কি বাজি ধরে? আর সেখানেও যদি ভয়ংকর রংটাই উঠে আসে? সে তো আত্মহত্যার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই উদয় কোনো একসময় ক্রিসের হাত থেকে তাসের প্যাকেটটা তুলে নিল। তারপর ছয় ঘোড়ার কোল্টটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওটা?

আমার লাশের পাশে ওটা পড়ে থাকবে। তুমি ক্যাপ্টেনকে বলে নিয়ে নিয়ো। আমি তোমাকেই দিলাম ওটা। আমার পোস্টমর্টেম রিপোর্টের সঙ্গে আমার একটা চিঠি তুমি লিজাকে পাঠিয়ে দিয়ে। সম্ভবত রিপোর্টে বলবে টেম্পোরারি ইনস্যানিটি। তুমি কিন্তু আসল কথাটা লিখবে ওকে। যে কথা আমিও চিঠিতে লিখেছি।

সেদিন মাঝরাত্তিরে টেন্টে টেন্টে অ্যালার্ম বেজে উঠল। যা হোক কিছু একটা গায় চাপা দিয়ে সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ চাপা দেওয়া আছে। ক্যাপ্টেন রাগে থরথর করে কাঁপছেন। সিভিয়ার ইনডিসিপ্লিনের অভিযোগে পারতপক্ষে সবাইকেই দায়ী করলেন ক্যাপ্টেন এগার্ট। এতগুলো লোকের কেউ কি জানত না ক্রিস মানসিক রোগে ভুগছিল? তাহলে তাঁকে সে-কথা জানানো হয়নি কেন? কেন একটা মানসিক রোগীকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে? কেউ কি তার মনের খবর রাখার চেষ্টা করেনি?

যন্ত্রচালিতের মতন একসময় উদয় এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি জানতাম।

পোস্টমর্টেমের সিদ্ধান্ত হল ক্রিস আত্মহত্যাই করেছে। তার অস্থায়ী উন্মাদনার সময় তার বন্ধুরা তার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তাকে বোঝায়নি। ক্যাম্প রিপোর্ট জানাল একটা তাস এবং রিভলবারের লোভে উদয় চৌধুরী তার প্রিয় বন্ধুর আত্মহত্যা নির্দ্বিধায় বরদাস্ত করেছে।

যুদ্ধ শেষ হতেই উদয় স্বেচ্ছায় অবসর চাইল। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে দেখাল মেন্টাল ইনস্ট্যাবিলিটির। জমা টাকা তুলতে গিয়ে উদয় ক্রিসের বাজেয়াপ্ত রিভলবারটার খোঁজ করল। ওটা ক্রিসের নিজস্ব অস্ত্র ছিল। বেআইনিভাবে রাখা। নিজের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র একে একে সারেণ্ডার করার পর উদয় যখন রিভলবারটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন লিখল তখন ক্যাপ্টেন এগার্ট বললেন, তোমার ডক্টরস সার্টিফিকেটের ব্যাকগ্রাউণ্ডে, আমি তোমায় আর আইনত এই অস্ত্র দিতে পারি না। তবে বন্ধুর একটা উপহারের থেকেও আমি তোমায় বঞ্চিত করব না। আমি জিনিসটা হারিয়ে গেছে বলে রেকর্ড বুকে দেখাব। আর আমার অনুরোধ তুমিও এই যন্ত্র আর কোনোদিন কাজে লাগাবে না, একটা স্মৃতি হিসেবেই রেখো। বাট বি কেয়ারফুল।

তার চার বছরের মধ্যে একবারও উদয় ওর ট্রাঙ্ক খুলে জিনিসটা দেখেনি। ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারির সকালটায় নেহাতই দুর্ঘটনার মতন তাস এবং রিভলবারটা বেরিয়ে পড়ল। উদয়ের যেসব কোল্ট টোটা ছিল সেগুলোও যে কেন ও ক্যাপ্টেনের কাছে সারেণ্ডার করেনি সেটা ভেবেও অবাক হয়ে গেল। নিজের রিভলবারটা দিয়েও কেন সেদিন গুলিগুলো দেয়নি? চকিতে ওর মনে পড়ল ক্রিসের কথা। ভাগ্য খুব রহস্যময়। তার আনন্দ এবং দুঃখ দেবার পথও রহস্যে ঢাকা। না হলে এতদিন পরই বা ওর গুলির কথা মনে আসবে কেন? এতকাল তো ও জানত ওর কেবল রিভলবারটাই আছে।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে উদয়ের মনে হল যে, মারণাস্ত্রেরও একটা নিজস্ব প্রাণ আছে। একটা চরিত্র আছে। যে প্রাণ, যে চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই একেক সময় মানুষের ভাগ্য স্থির করে। সেই পর্যায়ে কোনো অস্ত্র এসে পৌঁছেলে একটা মানুষ তখন নিতান্তই যন্ত্র। সে তখন যন্ত্রের মতোই একটা মারাত্মক প্রাণীকে ব্যবহার করে।

একবার অন্তত ক্রিসের খেলাটা খেলার ইচ্ছে হল উদয়ের। নিজেকে বাজি রেখে নয়। অথচ ওর প্রিয়জন বলতে বিশ্বসংসারে কে-ই বা আছে? অন্তত সেরকম কেউ নেই। এক স্কুলের বন্ধু ছিল। কিন্তু সেও তো বহু দিন ধরে সুখী গৃহস্থ। তাকে মেরে একটা সংসার নষ্ট করার ইচ্ছা ওর হওয়া কঠিন। তা ছাড়া একটা ঘৃণ্য খুনি হওয়ার চেয়ে আত্মহনন শ্রেয়। অথবা...অথবা, তার চেয়েও শ্রেয় কাজ কাউকে ভালোবেসেই হত্যা করা। যে হত্যা সম্ভবত নিহত মানুষটিকে অনেক বড়ো গৌরব এনে দেবে। সম্ভবত তাঁকে শহিদের বেদিতে বসাবে।

যে মৃত্যুর ফলে তিনি বৃহত্তর এক শক্তি হিসেবে সমাজে কাজ করবেন। উদয়ের মনে পড়ল গান্ধীজিকে। সেদিনের কাগজেই গান্ধীজির ছবিটা হাসি হাসি মুখ করে জ্বলছে। হাজারো সমস্যা, অশান্তি এবং অঘটনের মাঝখানেও সে হাসিটুকু অম্লান আছে। তাস বার করে গান্ধীজির নামেই বাজি ধরল। রং নিল রুহিতন। কারণ ওর ধারণা রুহিতন চাইলেই আসে না। এভাবেও অন্তত গান্ধীর হত্যা এড়ানো যেতে পারে।

বার বার শাফল করে তিন-তিনটে তাস চোখ বুজে টানল উদয় চৌধুরী। এবং চোখ মেলে দেখল তিনটে তাসই রুহিতন।

একটা তীব্র বিদ্যুৎ খেলে গেল উদয়ের গোটা শরীরে। কিন্তু সে নিরুপায়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল সকাল সাতটা। চটপট করে সে দাড়ি কামাল, তারপর বহুক্ষণ ধরে তার জীবনের সেরা লাক্সারি সেই স্নানটুকু শেষ করল। ততক্ষণে ওর মনে হতে শুরু করেছে এই বুঝি তার শেষ স্নান। বিড়লা হাউসে সে যদি ধরা পড়ে তবে তার ফাঁসি নির্ঘাৎ। কাল হয়তো খবরের কাগজে গান্ধীজির সঙ্গে ওর নিজের ছবিই বেরুবে। কোটি কোটি লোককে কাঁদিয়ে সে একজনকে অমর করবে আজ বিকেলে। ভাগ্যবিধাতাই সেটা নির্ধারণ করে রেখেছেন, নতুবা পর পর তিন টানেই রুহিতন উঠল কোন নিয়মে? একসময় সহসা উদয়ের মনে হল হয়তো স্বয়ং ঈশ্বরই চান এইভাবে গান্ধীকে মানুষের মাঝখানে ব্যাপ্ত করে দিতে। এবং সেই কাজের জন্যই তিনি নির্বাচন করেছেন উদয় চৌধুরীকে।

উদয় যেটুকু রাজনীতি বোঝে তাতে ওর গান্ধীজির ওপর অগাধ শ্রদ্ধা। বাঙালি হিসেবে যেটুকু রাগ ওর হয়েছিল তার সবটাই ধুয়ে মুছে গেছে গান্ধীজির নোয়াখালি অভিযানের পর। অথচ এতখানি শ্রদ্ধা নিয়ে কি কাউকে আঘাত করা যায়? পুরো ব্যাপারটা ক্রমশ ওর কাছে একটা মার্সি কিলিং-এর মতন ঠেকল। এবং সেই করুণার সূত্রে অমোঘ এবং করণীয়।

দুপুরের খাওয়ার আগে উদয় গান্ধীজির ফটোতে মালা-চন্দন পরাল। নিজের বেসুরো গলায় একটা ভজন গাইল। তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বইয়ের তাক থেকে হাউ টু কমিট আ পারফেক্ট মার্ডার থ্রিলারটা নিয়ে পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা তিনটে। পলসনের কৌটো ভেঙে কফি বানাতে বানাতে উদয়ের মনে পড়ল ওর ছোটোবেলার প্রেমিকা পৃথাকে। খানিকক্ষণ ওর কথা ভাবতেই উদয়ের একটা ঘোর সৃষ্টি হল মনে। পৃথা এবং ওর স্বামী কালকের কাগজ পড়ে কী ভাববে? সারাজীবন ধরে

উদয়ের যে একটা সাড়া জাগানো কান্ড করার ইচ্ছে ছিল এই বুঝি সেই সাড়া জাগানো মহাকাজ!

রিভলবারে তিনটে টোটা ভরল উদয়। পকেটে দুটো সিগারেট নিল রাস্তায় ফুকতে ফুকতে যাবে। দিল্লিতে শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। ট্যাক্সি ডেকে যখন উদয় বিড়লা হাউস নামটা উচ্চারণ করল তখন ওর চোখের সামনে ভাসছে ক্রিসের মৃতদেহের ছবিটা। ভীষণ ইচ্ছে হল ওর ট্যাক্সি ছেড়ে উলটোদিকে দৌড় লাগায়। একসময় দরজার হাতলেও হাত রাখল। অমনি ড্রাইভার গর্জে উঠল, দরওয়াজা মৎ খিচিয়ে সাব! উদয় চোরের মতন হাত গুটিয়ে নিল।

বিড়লা হাউসের অনেক দূরেই গাড়ি থামল। তখন বেলা চারটে পঞ্চাশ। উদয়ের ধারণা ছিল গেটে পাহারাদাররা তার সমস্ত শরীর সার্চ করবে। তাই রিভলভারটা সে ধুতির কোঁচায় এঁটেছিল। এমনিতে উদয় প্যান্ট-শার্টই পরে। কিন্তু প্যান্ট-শার্টে বন্দুক লুকোনো মুশকিল। এ ছাড়া কিছুদিন ধরেই গান্ধীজিকে হত্যা করার একটা চক্রান্ত চলছে কোনো এক বিশেষ মহলে। তাই পাহারাদারিও খুব কড়া পর্যায়ের হচ্ছিল। অথচ সেদিন বিকেলে উদয়কে কেউই কিন্তু কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ বা সার্চ-টার্চ কিছুই করল না। ভিড়ের সঙ্গে উদয় বিড়লা হাউসের বাগানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে মহাত্মাজির জন্য একটা ডায়াসও বানানো হয়েছে। উদয় যতখানি পারল তার কাছে যাবার চেষ্টা করল। কারণ বহুকাল সে আর রিভলবার ব্যবহার করেনি। টিপটা আর আগের মতন নেই বলেই ওর ধারণা।

বিকেল পাঁচটায় গান্ধীজির প্রার্থনাসভায় আসার কথা অথচ পাঁচটা দশ বেজে যেতেও তাঁর দর্শন পাওয়া গেল না। উদয়ের ভয় হল, গান্ধীজি বুঝি অসুস্থ। না হলে ওঁর মতন সময়ানুবর্তী মানুষের তো এরকম দেরি হওয়ার কথা নয়। ওর একটু সন্দেহও হল, এই বুঝি পুলিশ এসে প্রত্যেককে আপাদমস্তক সার্চ

করতে শুরু করে। উদয়ের ইচ্ছে ছিল গান্ধীজি প্রার্থনাসভা শুরু করলে সবাই যখন চোখ বুজে মন্ত্র আওড়াবে ঠিক সে-সময় এক মওকায় গুলিটা ছুড়বে। ভয়ের ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে উদয় ইতি-উতি চাইতে থাকল। এবং ওর নজরে পড়ল পৃথার বৃদ্ধ বাবা অবসরপ্রাপ্ত জজ ব্রজেন্দ্রনাথ সান্যালকে। যাঁর পাশে তখন তৃতীয় স্ত্রী আবেদা খাতুন। বসে ঝিমুচ্ছেন। দপ করে জ্বলে উঠল উদয়ের মাথাটা। প্রচন্ড ইচ্ছে হল ওর জীবনের সমস্ত বিপন্নতা এবং দুঃখের মূল ওই ব্রজেন সান্যালের মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেয়। পৃথার পাণিপ্রার্থী হয়ে যে চরম অপমান পেয়েছিল উদয় ব্রজেন সান্যালের কাছে তা এখনও ওকে থেকে থেকে সাপের ছোবলের মতন দংশন করে। রাগের চেয়েও অনেক বেশি ঘৃণা লুকিয়ে আছে উদয়ের মনে ওই বিশেষ অধ্যায়টির ব্যাপারে।

নিজের গায়ে অসম্ভব জোরে একটা চিমটি কেটে রাগ সংবরণ করল উদয়। আজ হেলাফেলার দিন না। আজ ওর একটা মিশন আছে। নরকের কীটপতঙ্গকে গুলি করে সে কাজ ভেস্তে দেওয়া যায় না। ঘড়িতে যখন পাঁচটা তেরো তখন কিছুটা আশ্বস্ত হল উদয়। ইতিমধ্যে একটা শোরগোল শুনতে পেল সে। বিড়লা হাউসের বুগেনভিলিয়ার আচ্ছাদনের সড়ক দিয়ে না এসে সটান লনের ওপর দিয়েই গান্ধীজি আসতে শুরু করেছেন। তাঁর দুই হাত আভা এবং মানুর কাঁধে ছড়ানো। মানুর হাতে একটা পিকদানি, মহাত্মাজির চশমা এবং সেদিনের তৈরি তাঁর বক্তৃতার কাগজপত্র। দুই মহিলার কাঁধে ভর করে গান্ধীজি যতখানি সম্ভব এস্ত পায়ে আসছেন। দেরি করিয়ে দিয়েছে বলে ক্রমাগত বকছেন তাঁদের। জীবনে গান্ধীজি এই দেরি করাটাই সবচেয়ে ঘৃণা করেছেন। বলছেন, তোমরাই না আমার ঘড়ি। তোমরাই তো আমায় মনে করিয়ে দেবে সময় কত। জানো না, আমি প্রার্থনায় দেরি করা সহ্য করতে পারি না?

গান্ধীজি তখনও বকে চলেছেন যখন তিনি প্রার্থনাসভায় ঢোকার চার ধাপ সিঁড়ির গোড়ায়। গান্ধীজির মাথায় তখন ডুবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি মেয়েদের কাঁধ থেকে হাত তুলে জনতাকে নমস্কার জানালেন। তারপর যখন সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালেন তখন...তখন উদয়ের মনে হল সে একটা স্বপ্ন দেখছে। না, এ হতে পারে না। উদয় তার রিভলবারের জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখল সেটা যথাস্থানেই আছে। কোনো অনিয়ম হয়নি সেখানে। অথচ স্পষ্ট শুনল তিন তিনটে গুলির আওয়াজ। তিনটে আওয়াজই ওর নাড়ি ভেদ করে শরীরের অভ্যন্তরে চলে গেছে। মনে হল ওই গুলিগুলো কেউ ওকেই তাক করে মেরেছে। উদয় উদভ্রান্তের মতো গান্ধীজির দিকে ছুটে গেল। তখন 'হে রাম' বলে বুকে রক্তমাখা গান্ধীজি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। মানু তাঁর পিকদানি আর বক্তৃতার কাগজগুলো অন্ধের মতো মাটিতে হাতড়াচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য উদয় একটা খাকি জামা পরা রোগাটে লোককে দেখতে পেল। উদয়ের নজরে পড়ল লোকটার হাতের 'বোর' পিস্তলটাও। তারপর সবটাই অন্ধকার দেখল উদয় চৌধুরী।

সেদিন কার সাহায্যে, কীভাবে বাড়ি ফিরেছিল তা আর ওর মনে পড়ে না। আজ সকালের কাগজে সেই খাকি পোশাকের মানুষটার কথা লেখা আছে। নাথুরাম গডসের ফাঁসি হয়েছে। আজ উদয় জানে না সে ভয়ংকর দুঃখী না সুখী। আজ তার এমন কোনো কারণ নেই ফের নিজের মুখোমুখি হওয়ার। গান্ধীজির মৃত্যুর সঙ্গে সে কোনোভাবেই জড়িত না। গান্ধীজিকে শহিদ হতে সে কোনোই সাহায্য করেনি। ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ, সে কেন গুলি আর তাসের খেলা খেলেছিল সেটুকুও ওর আর মনে নেই। অথচ কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণে ফের ওর সেই খেলাটা খেলে দেখতে ইচ্ছে জাগছে। তবে আজ ও বাজি রাখতে চায় কেবল নিজেকেই। ওর ভীষণ জানা দরকার ওর মৃত্যু এবং ভালোবাসার রং হরতন ওঠে কি না। এরকম এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে ওর

হাতে হরতন উঠলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হবে না। জীবনের গুটি কয়েক দিনে নিজের মাথায় গুলি ভরে দেওয়া খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কোনো পিছুটান থাকে না, কোনো আফশোস থাকে না। মনে হয় পুরো জিনিসটাই একটা নিরুপদ্রব খেলা।

উদয় বহুক্ষণ শাফল করে চোখ বুজল। এবং একটা একটা করে তাস টানতে লাগল।